সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ ❑ বুলেটিন নং ৩১

ইউপিডিএফ-এর অর্ধযুগ পূর্তি

২৬ ডিসেম্বর ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ-এর ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির বোঝাপড়া, চুক্তি, আত্মসমর্পন ও জনগণের বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন বিকিয়ে দেয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৯৮ সালের এদিন নতুন যুগের এই নতুন পার্টির আবির্ভাব ঘটে।

ছয় বছর আগে তখন চুক্তির মহা জয় জয়কার। শান্তির জারিগানে বিভোর সারা দেশ। যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এথনিক ক্লিনজিং এর রূপকার ও সহযোগী তারাও রাতারাতি শান্তির উপাসক বনে যান। চুক্তির সমালোচনা করা তখন অপরাধের সামিল। যেন চুক্তিটা একটা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ঠিক এমনি সময়ে সত্য উচ্চারণ করতে ও জনগণকে আন্দোলনের নতুন দিশা দিতে ইউপিডিএফ স্রোতের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়।

ইউপিডিএফ আজ শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন সারা দেশে একটি পরিচিত নাম। জনগণের মধ্যে পার্টির ভিত্তি এখন অনেক সুদৃঢ়। গণতান্ত্রিক দল হিসেবে দেশে বিদেশে স্বীকৃত।

কিন্তু পার্টির এই অর্জন এত সহজে হয়নি। এর জন্য গত ছয় বছরে পার্টিকে বহু ঘাত প্রতিঘাত মোকাবিলা করতে হয়েছে। বহু ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে হয়েছে। অসংখ্য কর্মি, সহযোদ্ধা, শুভাকাঙ্খী ও সমর্থকের আত্মবলিদান ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে আজকের পার্টির ভিত্তি গড়ে উঠেছে। শুরুতেই পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য জনসংহতি সমিতি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী শক্তির সাথে এক পবিত্র ঐক্য গঠন করে। পার্টি কর্মি ও শুভাকাঙ্খীদের ওপর চালানো হয় নিষ্ঠুর দমন পীড়ন। সন্তু লারমা স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে ইউপিডিএফ নেতা কর্মি ও সমর্থকদের গলা টিপে হত্যা করা, হাত পা ভেঙে দেয়া ও চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তাদের পার্টি কংগ্রেসে ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করার প্রস্তাবনাও পাশ করা হয়। এর আগে বাঘাইছড়িতে অনুষ্ঠিত তাদের কর্মি সম্মেলনেও একই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ইউপিডিএফ নির্মূলের এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য সন্তু লারমা তার দলের সশস্ত্র সদস্যদের লেলিয়ে দেন। ফলে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি ও অরাজকতার রাজত্ব কায়েম হয়। খুন, অপহরণ, গুম, মুক্তিপণ আদায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। জনগণের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বসে সরকারের আশির্বাদ নিয়ে সন্তু লারমা চক্র নির্বিঘ্নে এ ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

ইউপিডিএফ এই খেলা বন্ধ করার জন্য সন্তু লারমার প্রতি বার বার আহ্বান জানায়। দেশে বিদেশের অনেকেই সমঝোতার চেষ্টা চালান। কিন্তু সন্তু লারমার একগুঁয়েমির কারণে তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি ঐক্য ও সমঝোতা কেন, আলোচনায় বসতে পর্যন্ত রাজি হননি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনগণ তার ইউপিডিএফ নির্মূলের কর্মসূচী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। যতবারই তিনি তার সশস্ত্র সদস্যদের লেলিয়ে দিয়ে পার্টিকে নির্মূলের দুঃসাহস দেখিয়েছেন ততবারই পার্টির নেতৃত্বে জনগণ তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও এর কোন ব্যতিক্রম হবে না, সে ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির নেতারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

জনসংহতি সমিতির সাথে তাল মিলিয়ে সরকার এবং সেনাবাহিনীও ইউপিডিএফ-এর ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক পার্টি কর্মি ও সমর্থককে বিনা কারণে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৮০ জনের মতো পার্টি কর্মি কারাগারে অন্তরীণ আছেন। সেনাবাহিনীর গুলিতে বেশ কয়েক জন পার্টি কর্মি প্রাণ হারিয়েছেন, অনেকে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এত নির্যাতন, দমন পীড়ন ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ইউপিডিএফ-কে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। বরং পার্টি সেইসব মোকাবিলা করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ইউপিডিএফ কেবল একটি নাম নয়, একটি আদর্শ। এই পার্টি জনগণেরই পার্টি। আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তার জন্ম। কিন্তু আজ আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার পথে ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জনসংহতি সমিতি। এই বাধাকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সময়ের দাবি মেটাতে যে পার্টির আবির্ভাব তার অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য। কোন অপশক্তি ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করতে পারবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশে ইউপিডিএফ এক উদীয়মান সূর্য। সংগ্রামী চেতনায় উদ্বেল এই পার্টিকে নিয়েই জনগণ নতুন করে স্বপ্ন দেখবেন। আবার নতুন করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

জনসংহতি সমিতির ঘরে হতাশার কালো আঁধার

ইহুদীদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলো জেরুজালেমের যে পশ্চিম দেয়ালটি আছে সেখানে গিয়ে বিলাপ ও ক্রন্দন করা। সেজন্য এই দেয়ালটির নাম দেয়া হয় Wailing Wall. এই দেয়ালটি টেম্পল মাউন্ট-এর অংশ এবং এটি নির্মাণ করা হয় খ্রীষ্ট-পূর্ব২০ সালে। এক সময় মন্দিরটি ভেঙে দেয়া হলে ইহুদিদেরকে বছরে মাত্র একবার সেখানে যেতে দেয়া হতো। তখন তারা ধ্বংসাবশেষের সামনে গিয়ে পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে থাকেন।

জনসংহতি সমিতির নেতাদেরও একটি বাৎসরিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হলো ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ সেমিনার, আলোচনা সভা কিংবা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ইহুদীদের মতো চুক্তির জন্য কান্নাকাটি করা। এটা তাদের এখন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এ বছর তাদের এই কান্নাকাটির অনুষ্ঠানে কান্না ছিল কম, হতাশা ছিল বেশী। তারা নিজেরাই বলেছে যে তারা হতাশা, ক্ষোভ ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে চুক্তির ৭ম বর্ষ পালন করেছে। অর্থাৎ যে আশা নিয়ে তারা চুক্তি করেছে তা সব শেষ, তাদের ঘরে এখন কেবল হতাশার কালো অন্ধকার। যতই দিন যাবে তাদের হতাশা আরো বাড়বে।

এখন কথা হলো, যে পার্টির নেতৃত্ব হতাশ, চোখেমুখে কেবল অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে, তারা কিভাবে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে? যে নিজেই হতাশ সে আবার কাকে আশার বাণী শোনাবে? যে অন্ধ সে কিভাবে অন্যকে পথ দেখাবে? জেএসএস নেতৃবৃন্দ নিজেরা অন্ধ হয়েও জনগণকে পথ দেখাতে চান - বিপত্তিটাতো সেখানেই।

কান্নাকাটি আর আন্দোলন এক জিনিস নয়। অধিকার আদায়ের জন্য দরকার আন্দোলন। এমনকি যে চুক্তিকে নিয়ে জেএসএস-এর এত আশা তার বাস্তবায়নের জন্যও দরকার আন্দোলন। অথচ জেএসএস নেতৃবৃন্দ ঠিক সেই কাজটাই করতে নারাজ। ইউপিডিএফ বহু আগে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে জনসংহতি সমিতিকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দেবার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেএসএস আন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। উল্টো ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের কর্মসূচী হাতে নেয়। নিজেদের রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শীতার জন্য আত্মসমালোচনা না করে, জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়ার অপরাধের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা না চেয়ে জেএসএস-এর অধঃপতিত নেতৃত্ব চক্র ইউপিডিএফ-এর উপর আক্রমণ চালিয়েই নিজেদের অক্ষমতার ঝাল মেটাতে চায়। নেতৃত্বের এই ত্রুটি বিচ্যুতির কারণেই তারা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে যাই হোক, তাদের হতাশার ঘোর অন্ধকার আর কাটবে না। অন্ধকারেই তারা একসময় হারিয়ে যাবে। সেটাই তাদের নিয়তি।

পার্বত্য চুক্তির জন্য আওয়ামী লীগের কুম্ভিরাশ্রুপাত

পর্যবেক্ষক

চাকমা ভাষায় একটা কথা আছে যা হলো এ রকম: "ন'পাদে হেড-উয়া মানে, ঘোড়ায়া মানে"। এর আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ হতে পারে: না পাওয়ার আগে হাতি ঘোড়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া। যদি কেউ অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকাকালে কাঙ্খিত কোন কিছু পাওয়ার জন্য কাউকে সবকিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু পাওয়ার পর তার পক্ষ থেকে সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন তার সম্পর্কে এই উক্তিটি করা হয়।

ক্ষমতা থেকে নিক্ষিপ্ত আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এখন সব ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেড়াচ্ছে। যে চুক্তি তারা নিজেরাই সম্পাদন করেছে, কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালে বাস্তবায়ন করেনি, সে চুক্তিকে তারা আবার ক্ষমতায় গেলে বাস্তবায়ন করবে বলে অঙ্গীকার করছে। সরকারের বিরুদ্ধে তারা যে ৯ দফা কমন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে তার মধ্যে একটি দফা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা। চুক্তি বাস্তবায়ন না করার জন্য তারা জনসংহতি সমিতির সাথে সুর মিলিয়ে সরকারেরও সমালোচনা করছেন। অথচ তারা বেমালুম চেপে যাচ্ছেন যে, ক্ষমতায় থাকাকালে তারা কেবল চুক্তি অবাস্তবায়িত রেখেছেন তাই নয়, তারা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের আত্মসমর্পনের সাথে সাথেই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করতে থাকেন। যে অভিযোগে আওয়ামী লীগ আজ বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে অভিযুক্ত করছে, সে একই অভিযোগে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নিজে। সুতরাং চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মধুর কথায় বিশ্বাস করলে জনসংহতি সমিতিকে যে আবার ঠকতে হবে সেটা চোখ বন্ধ করেও বলে দেয়া যায়। ন্যাড়া একবারই বেল তলায় যায়। সন্তু লারমারা আবার "আওয়ামী লীগের তলায়"যাবেন কিনা সেটা অবশ্য তাদেরই ব্যাপার। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণ এত বোকা নন যে, তারা চুক্তির জন্য আওয়ামী লীগের কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণকে বুঝতে পারবেন না। জনগণ জানেন, ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে চুক্তি করা হয়েছে তাতে মৌলিক দাবিগুলোর কোনটাই পূরণ হয়নি বিধায় আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি, আবার ক্ষমতায় গেলেও করবে না। এমনকি চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হলেও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটাই হচ্ছে সত্য, যা আজ সবার কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

আওয়ামী লীগ যে কেবল জনসংহতি সমিতিকে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাই নয়, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বাম দলগুলোকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে নিয়ে আসার জন্য সে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এই প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিবি'র সাথে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের আলোচনা হয়। ঐ আলোচনায় ঐক্যের জন্য সিপিবি কয়েকটি শর্ত আরোপ করে। পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে আব্দুল জলিল সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে ঐ সব শর্ত মেনে নেন। এতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান, কারণ তারা নাকি ধারণাই করতে পারেননি আওয়ামী লীগ ঐ সব শর্ত মেনে নেবে। শর্তগুলো হুবহু এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে যতদূর মনে পড়ে এই সব শর্তের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা বা এই ধরনের কিছু ছিল। যে আওয়ামী সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাস, সে আওয়ামী লীগ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে!

জনসংহতি সমিতির নেতাদের একটা বড় দুর্বলতা হলো তারা বাংলাদেশের রাজনীতির হাটবাজার সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। সে জন্য তাদেরকে বার বার ঠকতে হচ্ছে। তাদের অবস্থা হলো হঠাৎ কোন অজ পাড়া গাঁ থেকে অলিগলিতে ভরা কোন বড় শহরে আসার মতো। পথ হারিয়ে তারা আওয়ামী লীগ নামক গলির মাস্তানটির হাতে পড়েছে ও সর্বশান্ত হয়েছে। সব হারিয়ে জেএসএস এরএখন খুবই করুণ দশা। একটু খানি করুণাও এখন তাদের জন্য বড় প্রাপ্তি।

আওয়ামী লীগের সাথে জেএসএস এর মৌখিক চুক্তি একবার নয়, বহুবার হয়েছে। এবং প্রত্যেকবারই আওয়ামী লীগ সেই চুক্তির বুকে লম্বা ছুড়ি বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেএসএস নেতারা আওয়ামী লীগের লেজ ছাড়তে নারাজ। তাদের অবস্থা যেন এমন, "ভেঙেছো কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না।" চুক্তি লঙ্ঘন করেছো তো কি হয়েছে! ক্ষমতা নামক ফলটি পারার জন্য কি তোমাকে আমার কাঁধে চড়তে দেব না! (ফলটি পেরে আনার পর খেতে পাই আর না পাই তাতে কি এসে যায়!)।

সন্তু লারমাদের মতো রাজনৈতিক আদিচরণরা যতদিন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকায় থাকবেন ততদিন পর্যন্ত বিভ্রান্তির পর্ব চলতেই থাকবে। সেজন্য দরকার অতি শীঘ্র আসল নায়ক রাধামনের আবির্ভাব।

এখানে সন্তু লারমাকে আদিচরণের সাথে তুলনা করার কারণ হলো, চাকমা পালাগান রাধামন-ধনপুদি পালায় ভিলেন আদিচরণ একবার তিন মন তুলা নিয়ে বাজারে যায়। তাকে দেখেই বেপারীরা তাকে ডাকতে থাকে। উদ্দেশ্য ভুলিয়ে ভালিয়ে কম দামে তার তুলাগুলো কিনে নেয়া। আদিচরণ ছিল হাবাগোবা ধরনের, অংকের হিসাব সে বুঝতো না। তিন মন তুলার দাম কত তাও সে জানে না। ফলে শেষ মেষ বোকা আদিচরণ চতুর বেপারীদের কথায় তিন মন তুলা মাত্র ৩ পয়সায় বিক্রি করে দেয়। এরপর সে এক পয়সা দিয়ে খইমলা কিনে খায় (সেখানেও সে ঠকে), আর বাকি দুই পয়সা ধুতির কোঁচায় রেখে দেয়। বাজার ঘুরে এটা ওটা দেখতে দেখতে ধুতির কোঁচা থেকে সেই দুই পয়সাও এক সময় হারিয়ে যায়। আদিচরণ ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হলেও এভাবে বেপারীদের কাছে ঠকতে ঠকতে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

সন্তু বাবুদের অবস্থাও হয়েছে আদিচরণের মতো। রাজনৈতিক অংকের হিসাব না বোঝার জন্য আদিচরণের মতো তাদেরকে ঠকতে হয়েছে। ফলে তাদের আজ এই দুর্গতি। আকাশে বাতাসে হা হুতাশ ছড়িয়ে চুক্তির ৭ম বর্ষ পালন করতে হচ্ছে তাদের। চোখে তারা এখন কেবলই অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে। মানুষ সব সময় যে লাভ করে এমন নয়। কিন্তু কেউ যদি একই লোকের কাছে বার বার ঠকে, প্রতারণার শিকার হয়, তখন তাকে গণ্ডমূর্খ ও এমনকি বেকুব না বলে কি বলা উচিত? আওয়ামী লীগ এখন কি কারণে চুক্তিটির জন্য এত মায়াকান্না করছে তা কেবল তারাই বুঝতে পারবে না যারা আওয়ামী লীগকে একটি জাতীয় বুর্জোয়া দল মনে করে। এই বিভ্রান্তি র জন্যই তাদেরকে বার বার আওয়ামী লীগের কাছে ঠকতে হয়।

অথচ আওয়ামী লীগ সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দেরই বেশী সতর্ক হওয়ার কথা। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ কর্তৃক তারাই বেশী নিগৃহীত হয়েছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান স্বায়ত্তশাসনের দাবি কেবল উপেক্ষা নয়, স্মারকলিপি পেশ করতে গেলে তিনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও অন্যান্য পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে চরমভাবে অপমানিত করেছিলেন এবং নিজের জাতিগত পরিচয় ত্যাগ করে বাঙালী হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এত কিছুর পরও মানবেন্দ্র লারমা কেন যে শেখ মুজিবর রহমানের বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন সেটা এই অধমের বোধগম্যের বাইরে। এর ব্যাখ্যা জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। সুতরাং আওয়ামী লীগ সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির বিভ্রান্তি একেবারে গোড়া থেকে। সে বিভ্রান্তি তাদের এখনও কাটেনি। এ ক্ষেত্রে ১ ডিসেম্বর ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে সন্তু বাবুর একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের মোর্চা যে আন্দোলন করছে, সেই ৯ দফা দাবি দেশের মানুষের মুক্তি আনতে পারে" (দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসে. ০৪)। দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগের কুম্ভিরাশ্রুতে সন্তু বাবুর মন গলতে শুরু করেছে এবং সাময়িক বিচ্ছেদ, মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে তাদের পুরোনো প্রেম আবার জেগে উঠতে পারে।